হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য-মহিমান্বিত একটি স্নানঘাট। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী। রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা বরাবর পূর্বমুখে আসিয়া এই ঘাটেই শেষ হইয়াছে।

সড়কটির দুই পাশে ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটি বাজার। বাজার মানে খান কুড়ি-বাইশ দোকান—খান কয় মিষ্টির, দুখানা মুদির, ছ-সাতখানা কুমোরের—মণিহারী, পানবিড়ি তো আছেই। ঘাটের একেবারে উপরে জন-দুই গঙ্গাফল, অর্থাৎ কলা ও ডাব বিক্রয় করে।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটিতে তিলধারণেরও স্থান থাকে না। চীৎকারে, গুঞ্জনে সারা বাজারটা গম গম করে, যেন একটা মেলা। অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। অন্ধকার জনহীন বাজার খাঁ-খাঁ করে। তখন দু-দশজন আগন্তুক যাহারা আসে—তাহারা শ্রান্ত শব-বাহকের দল। শব সৎকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ক্লান্তিতে, শোকে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, ফোঁটাকয় জলও কাহারও চোখ হইতে হয়ত গড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক দুই-চারিটা কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে, মৃত কিংবা মৃত্যুকে লইয়া। ঠিক যেন জলবুদ্বুদের মত, দুই-চারিটা পর পর উঠে, মিলাইয়া যায়, আবার নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা থম থম করে।

মোটকথা বাজারের কোলাহল তাহারা বাড়ায় না।

তখন যা-কিছু সাড়া, যা-কিছু চাঞ্চল্য, সে শুধু দোকান কয়টির। দোকানীরা আপন আপন দোকানে বসিয়া সমস্ত দিনের লাভ-লোকসান কষে, মুখে হাসি-গল্প চলে, হাতে কাজ করিয়া যায়।

শেষ কার্তিকের একটি শীতকাতর সন্ধ্যা।

বিড়ির দোকানদার ছকু বিড়ি পাকাইতেছে। কোথাকার মেলা-ফেরৎ কালীচরণ আপন দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। পাশে কুমোর বুড়ো কি একটা গড়িতেছিল, হাতে ময়দার মত মাটির নেচী। নেচী হইয়া উঠিল ডম্বরু। নিপুণ আঙুলের চাপে দেখিতে দেখিতে সেই ডম্বরুটির প্রান্তে গড়িয়া তুলিল দুটি কান,

মধ্যে লম্বা চেপ্টা মুখ, পিছনে বাঁকানো লেজ, নিচের দিকে চারিটি পা। সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠিল একটি ঘোড়া। পাশের লম্বা পিঁড়িখানার উপর একটির পর একটি করিয়া পক্ষিরাজের বাহিনী সাজাইয়া তোলা হইতেছিল।

কুমোর বুড়োর দোকানের সম্মুখেই রাস্তার ওপর বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। আপন চালাঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মাদুর বুনিতে বুনিতে কুসুম গল্প করিতেছিল কুমোর বুড়োর সঙ্গে। মেয়েটি অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ। তিনকুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী। মাদুর বোনা-ই বেচারীর জীবিকা। রোজই এমন গল্প চলে—সুখদুঃখের কথা, হাসির কথাও দুই-চারিটা হয়। এক একদিন কুমোর বুড়ো উপকথা বলে, কুসুম কাজ করিতে করিতে হুঁ-হাঁ করিয়া যায়। কুমোর বুড়ো থামিলে বলে—তারপর ?

পাল বলে—তারপর বুড়ো কর্তার বকে বকে গলা শুকোয়, তার তামাক খেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু নাতনীর তা সহ্য হয় না।

নাতনী কৌতুকে হাসিয়া উঠে।

ও-পাশে মুদীর দোকানে একটা দাবা টাকা লইয়া সেদিন বাজনা পরীক্ষা চলিতেছিল। খরিদ্দারের ভিড়ে কে কখন ঠকাইয়া গিয়াছে। পাশের দোকানীরা কেহ বলিতেছিল চলিবে, কেহ বলিতেছিল, না। মুদী বারবার টাকাটা সজোরে আছড়াইয়া আওয়াজ বাড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেটা ঠন করিয়া সাড়া আর দেয় না।

পাশের দোকানী বিড়িওয়ালা ছকুর বাবা দ্বিজদাস কহিল—ঠ্যাঙালে চীৎকার বেরোয়, সুর বের হয় না ভাই ; ও তুমি গঙ্গার নামে খরচ লিখে হাত ধুয়ে বস।

দ্বিজদাসের কথাটা মুদীর ভালো লাগিল না। সে আপন মনেই গালি দিল বঞ্চককে—কোন শালা গঙ্গাতীরে এমন বঞ্চনা করে গেল বল দেখি—পুণ্যি করতে এসে ?—

রসান দিয়া দ্বিজদাস কহিল—ফল হাতে হাতে পেয়েছে সে, টাকার ষোল আনাই তার লাভ।

ওদিকে কান দিতে গেলে দুঃখের বোঝা ভারি হয়। মুদী শাপ-শাপান্ত করিয়া আত্মপ্রবোধ দিল,—যা—যা গঙ্গাতীরে বঞ্চনা যেমন করলি, তেমনি নরকে যাবি, নরক হবে তোর। আমার না হয় ষোল আনাই গেল।

আবার ক্ষণপরে কহিল—তা বারো আনায় চলে যাবে, রানীমার্কা বটে, কি বল দাস ?

দাস নীরবে হাসিল, সেদিন তারও ঠিক এমনি হইয়াছিল

সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটির কোল পর্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রূপার পাতের মত চকচক করিতেছে। ঘাটের উপরেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে সর্বাঙ্গ শিরশির করে।

গঙ্গার মৃদুধ্বনি ছাপাইয়া কখনও কখনও দাঁড় ছপছপ করিয়া নৌকা চলে ঘাটোয়ার বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে চলে তার বুকের ক্ষীণ আলোক, গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকম্পিত প্রতিবিম্ব। দূর শ্মশানঘাটে রোল শোনা যায়,—বল হরি, হরি বো—ল!

মুদী কহিল—আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীরমুখে কহিল—খাতাটা কই রে ছকু?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা লইয়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

শ্মশান-ঘাট এবার দ্বিজদাস ডাকিয়া লইয়াছে। জমিদারকে বার্ষিক জমা দিতে হইবে এগারশ টাকা—সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান-জমা দু টাকা এক আনা।

মুদী কহিল—তোদের কপাল ভালো রে ছকু। এবার আসছে খুব।

কথাটা ছকুর তত ভালো লাগিল না, সে উত্তর দিল না, বিড়ির তাড়াগুলা লইয়া অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওপাশে কুমোর বুড়ো ঘোড়ার লেজ বাঁকাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিল—আজকাল সবই উল্টো হয়েছে গো, আজকাল হয়েছে কি জান—

নাই ধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে।

আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির ফাটছে।

গল্প হইতেছিল ডাকাতির।

টানার সুতার ফাঁকে ফাঁকে মাদুরের পাতি সুকৌশলে পরাইতে পরাইতে কাসেম হাসিয়া কহিল—তাহলে পালকত্তা, বল রাত্রে ঘুমোও না।

পাল-কর্তা কোনো উত্তর দিবার আগেই ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া হঠাৎ কেনারাম চাটুজ্জে পিছনের অন্ধকার হইতে দোকানের আলোর সম্মুখে যেন উদয় হইয়াই কহিল—কি রে, কার ঘুম হয় না রে বাপু?

পাল কহিল—নাতজামাই যে! এস, এস। কবে এলে?

কুসুম অবগুণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিল। কেনারামই কুসুমের স্বামী।

গ্রামে গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না, বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে। মাও নাই, বাপও নাই। বন্ধনের মধ্যে ওই কুসুম, সে বাঁধনও কেনারাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। আগে তবু ঘরে থাকিত, তখন সত্যকার একটি বন্ধন ছিল—তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হইল মেয়েটির মৃত্যুর পর সে সব ছাড়িয়াছে। এ-পাড়ায় বড় একটা আসে না, কুসুমকে একটা কথাও বলে না। কোথায় যায়—দশদিন বিশদিন কোথা থাকে, আবার একদিন আসে।

পাল-কর্তার সাদর অভ্যর্থনায় চাটুজ্জে কান দিল না—কার ঘুম হয় না সে লইয়াও মাথা ঘামাইল না। ওদিকে কালীর দোকানে তখন তাহার নজর পড়িয়াছে, কালীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—আরে কালী যে! তুই কবে ফিরলি মেলা থেকে, এঁ্যা?

তুপা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া আবার কালীকে প্রশ্ন করিল—তারপর মেলা কেমন দেখলি—বল দেখি? কই, বিড়ি দে রে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি-দেশলাই টানিয়া লইল।

কালী সংক্ষেপে কহিল—বেশ মেলা, খুব ভিড়, বেচা-কেনাও বেশ!

ঠাকুর তখন সদ্য বিড়িটা ধরাইয়াছে, মুখে তার একরাশ ধোঁয়া। কেরোসিনে টবের আলমারিতে খালি সিগারেটের বাক্স সাজাইতে সাজাইতে কালী কহিল—এবার ওখানে মেলাতে বেশ্যে বসতে দিলে না, দাদাঠাকুর! তুলে দিলে সব।

চাটুজ্জের মুখের ধোঁয়াটা অকস্মাৎ হ্রস করিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কহিল—সে কি রে—কে তুলে দিলে?

—গবরমেণ্টার হতে সাহেব এসেছিল যে। দারোগা পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন সব। তারাই দিলে। উঃ—দারোগাটা কি সাংঘাতিক মোটা মাইরি! ঠিক যেন গঙ্গার শুশুক, বুঝলি ছকু?

কেনারাম নীরবে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ কহিল—বসতে দিলে না? কি হল তাদের, কালী?

ওপাশে পালের গলা শোনা গেল—উঠলে যে ভাই নাতনী, এত সকালে?

কুসুমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময়টিতে সমস্ত বাজারটা হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃ

হইয়া পড়িল। এমন হয়, বহু লোক, বহু কোলাহলের মধ্যেও এমন এক একটি আকস্মিক নিস্তব্ধ মুহূর্ত আসিয়া যায়।

চাটুজ্জেই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল—তারা খুব গরিব, নয় রে কালী?

নতমুখে কালী কহিল—খু—ব।

ও পাশ হইতে ছকু ডাকিল—যাত্রা করতে হবে চাটুজ্জেমশায়—আমরা যাত্রার দল খুলছি।

চাটুজ্জে সাড়া দিল না।

ছকু আবার ডাকিল—শুনছেন দাদাঠাকুর?

বিরক্ত হইয়া চাটুজ্জে গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইল।

কালী হাসিয়া কহিল—মেয়েগুলোর ভাবনা ভাবতে বসেছে।

একটা ইঙ্গিত করিয়া ছকু কহিল—এদিকে নিজের পরিবারের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নাই!

মৃদুস্বরে কালী কহিল—কেন, পাল-কত্তা!

দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে কিন্তু আবার তখনই ফিরিল। গালে হাত দিয়া বসিয়া মহা চিন্তার সহিত সে কহিল—মেয়েগুলোর শেষ পর্যন্ত কি হল কালী?

—আর দাদা, সেইখানে সব না খেয়ে শুকিয়ে বেচারীরা—

বাধা দিয়া ছকু কহিল—না দাদাঠাকুর, ও ফাজিলটার কথা শোনেন কেন। তাদের সব ভাড়া দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

চাটুজ্জে মহাখুশী। কহিল—না, সে বেশ হয়েছে, এ খুব ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। সায়েবের মাথা রে বাপু!—তারপর একগাল হাসিয়া বলিল—তুই কি যেন বলছিলি ছকু?

—আমরা যাত্রার দল খুলছি। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-মিলন পালা হবে, তোমাকে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাজতে হবে।

অমনি গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া লইয়া চাটুজ্জে কহিল—হরিশ্চন্দ্র তা আমি সেজেই আছি রে, দেখবি!—শৈব্যা শৈব্যা, রোহিতাশ্ব রোহিতাশ্ব! কিন্তু খালি গায়ে যে শীত করছে রে!

—হ্যাঁ, বামুনের আবার শীত, বলে যার মুখের ফুঁয়ে আগুন! কিন্তু ও বক্তৃতায় তো হবে না দাদাঠাকুর, বই থেকে বক্তৃতা করতে হবে। এই দেখ বই কিনেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জে ছকুর মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর একটু হাসির সহিত কহিল—সত্যি বলছিস ছকু ?

—কবে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি, বল তো ?

—দে, তবে বই দে তোর। কি বক্তৃতা করতে হবে দেখি।

ছকু তাহাকে বইখানা আগাইয়া দিল। চাটুজ্জে বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—রানী, রানী, তুমি যে কখনও কোমল শয্যা ভিন্ন শয়ন কর নি, ও-হো-হো। বাপ রোহিতাশ্ব রে, সোনার পুতুল আমার—(রোহিতাশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিলেন)।

ও পাশে কালী ভ্যাঙচাইয়া উঠিল—বাপ যুধিষ্ঠির রে, (হনুমান কলা খাইতে লাগিলেন)।

এ পরিহাস চাটুজ্জে বুঝিল। বইখানা ছকুর দোকানে ফেলিয়া দিয়া সরোষে সে কহিল,—দেখ কেলে, তোর না হয় পয়সাই হয়েছে ; তাই বলে লঘু-গুরু মানামানি নাই তোর ?

কালী দমিল না, সে অঙ্গভঙ্গি করিয়া কহিল—ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান ইন এ লেন কোলোজ টু মাই ফারম।

ইংরেজীর কথা উঠিলেই চাটুজ্জে সদম্ভে এই লাইন কটি ঝর ঝর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

চাটুজ্জে আগুন হইয়া কহিল—আমি যদি বামুন হই তবে তোর—কি হবে জানিস ?

—কি হবে শুনি ?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া চাটুজ্জে কহিল—জানি না, যা। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেল। কালীর পরিহাসটা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। যাইতে যাইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই সে যেন কহিল—যা তুই বললি বললি, আমি শাপ দেব না তোকে। ফেটে মরে যাবি শেষে !

পাল-কর্তার মজলিশে তখন উপকথা জমিয়া উঠিয়াছে। কুসুম কখন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উপকথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পাল কহিল—এস, এস, নাতনী এস ! রাত বেশি হয় নি বস তুমি নইলে আসর জমছে না।

ভারি গলায় কুসুম উত্তর দিল—না কত্তা, দেহ বেশ ভালো নাই আমার।

তারপর অনাবশ্যক ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াই যেন সে কহিল—আলোটা আবার নিবে গেল, তেল নিয়ে আসি।

নির্বাপিত হ্যারিকেনটা লইয়া সে ঘাটের নিকটবর্তী মুদীর দোকানটায় গিয়া উঠিল।

চাপা গলায় ছকু কালীকে কহিল—শরীর ভালো নাই! চাটুজ্জে আজ এ পাড়ায় এসেছে কিনা!

কালী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। দোকানে হ্যারিকেনটা নামাইয়া দিয়া কুসুম কহিল—এক পয়সার তেল পুরে দাও তো।

মাপের হাতলওয়ালা বাটিতে ভরিয়া তেল পুরিতে পুরিতে দোকানী কহিল—তেল যে রয়েছে গো।

কুসুম গঙ্গার ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

আলোর মুখটা লাগাইয়া দিয়া মুদী আবার কহিল—আলো জেলে দেব, মা-ঠাকরুন?

সচকিত কুসুম কহিল—এ্যাঁ?

—আলো জেলে দেব?

—না থাক, বাড়িতে জেলে নেব আমি। হ্যারিকেনটা লইয়া সে চলিয়া গেল।

পাল-কর্তার মজলিশে তখন পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশ-পথে উড়িয়াছে।

চাটুজ্জে ঘাট হইতে ফিরিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ছকু তাহাকে ডাকিয়া কহিল—উঠে বসুন চাটুজ্জে মশায়। রাগ করলেন?

চাটুজ্জে কহিল—নাঃ, আর বসব না। ও পাড়ায় যাচ্ছি।

পাল তখন কহিতেছিল—পক্ষিরাজের পিঠে রাজপুত্তুর চড়লেন, আর পক্ষিরাজ শোঁ শোঁ করে আকাশে উড়ল—

চাটুজ্জের আর যাওয়া হইল না। তৎক্ষণাৎ পালের দোকানে ঢুকিয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বুড়ো বয়সে গঙ্গাতীরে বসে এত মিথ্যা কথা কেন বল, বল দেখি? শোঁ—শোঁ—করে আকাশে উড়ল! ঘোড়া আবার আকাশে ওড়ে।

ঘোড়ার কান গড়িতে গড়িতে পাল হাসিয়া কহিল—এস—এস ভাই, নাত-জামাই এস। দে-রে দে বসতে দে মোড়াটা। নাও তামাক খাও।

চাটুজ্জে মোড়ায় বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা বসাইয়া চাটুজ্জের হাতে দিয়া পাল কহিল—তবে আর উপকথা কাকে বলেছে ভাই!

হুঁকা টানিতে টানিতে চাটুজ্জে কহিল—তাই বলে যত সব মিছে কথা বলতে হবে নাকি?

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়া চাটুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বুড়া কহিল—যত সব নাতী-নাতনীতে এসে ধরে, কি করি বল?

—তবে তুমি বল, যত পার—পেট ভরে মিছে কথা বল। হুঁঃ—ঘোড়া নাকি আবার আকাশে ওড়ে!

উপকথা আগাইয়া চলিল—প্রবালদ্বীপের চিলে-কোঠা দেখা যাইতেছে, রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল-ভিজানো জলে স্নান-করা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ; সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারি পাশে গুন গুন করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশিল। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, আরও জোরে পক্ষিরাজ, আরও জোরে।

হঠাৎ বাধা পড়িল ময়রা বুড়ির হাসিতে—ও মাগো, এ-কে-গো! ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ, কাতুকুতু কে দেয় গো!

কাতুকুতু যে দিতেছিল তাহারও সাড়া পাওয়া গেল—কেঁউ কেঁউ কুঁ-কুঁ।

একটা কুকুরছানা! কোথা হইতে আসিয়া সেটা বুড়ির পিঠ চাটিতে শুরু করিয়া দিয়াছে!

বুড়ি চটিয়া আগুন, কহিল—আ-মর, মর মুখপোড়া কুকুর! আমি বলি কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

উপকথা ছাড়িয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাল কহিল—তাড়াও হে তাড়াও! দোকানে ঢুকলে সর্বনাশ হবে, ভেঙে ফেলবে। লাঠিগাছটা কই, লাঠিগাছটা?

বুড়ি খোঁজে ঝাঁটা, পাল খোঁজে লাঠি। চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি হুঁকাটা নামাইয়া কুকুর-ছানাটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর আলোয় আনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেটাকে দেখিয়া কহিল—আরে তুই কোত্থেকে এলি? এ যে শ্মশান-ভৈরবীর বাচ্চা ন্যাদাটা! শ্মশান ছেড়ে এখানে কি করতে এলি মরতে? চল হতভাগা তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি! যত সব অখাদ্য কাণ্ড, হুঁ!—চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িল।

পাল কহিল—শোন, শোন, যেয়ো না। ডাকছে, তোমায় ডাকছে ও—।

সম্মুখে কুসুমের আলোকিত মুক্ত দ্বার, দুয়ারের কাছে মেঝেয় কুসুম দাঁড়াইয়া,

চাটুজ্জে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কুকুরছানাটা কোলে করিয়া পথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পাল কহিল—শরীর খারাপ, বেশি রাত করে না; তুমি দোর দিয়ে শোও নাতনী।

কুসুম ততক্ষণে আলো হাতে বাহিরে আসিয়াছে। আবার সে বারান্দায় মাদুর বুনিতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পাল কহিল—শরীর খারাপ বলছিলে না নাতনী?

নতমুখে কুসুম কহিল—এটা কালই দিতে হবে কত্তা। গরিবের শরীর খারাপ হলে চলবে কেন বল? বল, তোমার উপকথা বল, কাজ করি আর শুনি।

কে একজন কহিল—কি যে করে গেল বামুন মা!

পালেদের ছি-চরণ কহিল—আহা সোনার প্রতিমা!

একজন কহিল—চাটুজ্জে তো ভালোই ছিল। মেয়েটি মরেই—

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া পাল উচ্চকণ্ঠে কহিল—চুপ চুপ, সব চুপ কর। উপকথা শোন, হ্যাঁ তারপর হল কি, পক্ষিরাজ এসে পড়ল আর কি, পা তার ছাদ ছোঁয় ছোঁয়—

কিন্তু একটা কলরোলের মধ্যে পালের কথাটা ঢাকা পড়িয়া গেল। দূরে শ্মশান-ঘাটে আবার রোল উঠিল—বল হরি—হরি বোল।

গঙ্গার তীরভূমির ঘন বন-সন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁসিয়া একটি স্বল্প-পরিসর পথ। পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নান-ঘাটের উত্তরে কিছু দূরে একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গভমুখে নামিয়াছে। ইহার দুধারে বুক-ভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশান-ঘাট।

চাটুজ্জে উপর হইতে এই পথে নামিল।

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে এক টুকরা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে-ওখানে দুই চারিটা নর-কপাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুকরায় মাটির বুক আচ্ছন্ন।

একটু অগ্রসর হইয়া চাটুজ্জে একখানি জীর্ণ টিনের চালায় আসিয়া উঠিল। চালাটার উত্তর দিকে রাজ্যের ছেঁড়া বিছানা গাদা হইয়া আছে। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধুনি। ধুনিটার কোল ঘেঁষিয়া একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা, চালাটার কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো লম্বা তারে বাঁধা একটা হ্যারিকেন মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিমে বাঁশে-চাটাইয়ে তৈয়ারী একখানা ছোট ঘর।

নিচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ নিশীথ-অন্ধকারের বুকে ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখার প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধুম পাক খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নিচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ-এগার বছরের কচি মেয়ে! ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে—কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটি মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! পুরা জোয়ান, নিকষকালো বর্ণ, মাথায় দীর্ঘ বাবরী-চুল অগ্নিতপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।

চালার উপরে দাঁড়াইয়া চাটুজ্জে ডাকিল—পৈরু!

মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে পৈরু বলিল—পরনাম—ঠাকুর মহারাজ, আসেন আসেন। কবে আসলেন দেশে?

—এই বিকেল বেলা রে। তারপর, ভালো আছিস তো?

—আপনার কিরপা মহারাজ।

—ছেলে-পুলে তোর?

—সবহি ভালো দেওতা!

কাপড়ে ঢাকা কুকুর-ছানাটাকে বাহির করিয়া চাটুজ্জে কহিলে—আরে তোর ন্যাদা বাচ্চাটা যে বাজারে গিয়ে পড়েছিল। শেয়ালে নিত আর একটু হলেই—! গলা চড়াইয়া চাটুজ্জে হাঁকিল—ভৈরবী, ভৈরবী! কাল্লু! কাল্লু—মহাদেও!

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই চালা-ঘরটা হইতে একপাল কুকুর আসিয়া চাটুজ্জেকে ঘিরিয়া লেজ নাড়িতে শুরু করিল। একটা আবার চিত হইয়া শুইয়া থাবা দিয়া চাটুজ্জের পায়ে আঁচড়াইতে লাগিল।

কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল—মা হয়ে ছেলের খোঁজ নাই হারামজাদী!

ভৈরবী কাতর মৃদু আর্তনাদ করিল, যেন অপরাধের মার্জনা চাহিতেছে!

চাটুজ্জে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া কহিল—যা, যা, সব শুগে যা—খুব আদর হয়েছে। যা—সব যা।

কুকুরের দল তবুও যায় না।

পৈরু হাসিল—হঠাৎ কুকুরের দল চীৎকার করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল। পলায়নপর জন্তুর পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—খ্যাক খ্যাক। টিনের চালায় খাটিয়াটার বিছানার ভিতরে কে যেন নড়িয়া-উঠিল। কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া একটি শিশু মুখ বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—এ—বাবা।

পৈরু উত্তর দিল—যাই, যাই হো মায়া,—ঘুম যাও, শো যাও—শো—যাও হো বিটিয়া।

শিশুটি বিছানায় মুখ লুকাইল।

চাটুজ্জে কহিল—তোর সেই খুকীটা,—না রে পৈরু?

—হাঁ মহারাজ, কিছুতে ছাড়ল না হামাকে আজ।

চিতাটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পৈরু হাতমুখ ধুইয়া উপরে আসিয়া কন্যাটিকে সযত্নে কম্বল ঢাকিয়া দিল। তারপর মাথার চুলগুলি তাহার হাতে করিয়া সাজাইয়া দিতে দিতে কহিল—বেটী হামার বহুত ভালা দেওতা, হামাকে বড়া পিয়ার করে।

চাটুজ্জে চিতার দিকে চাহিয়া ছিল, কথা কহিল না। বিড়ি বাহির করিয়া পৈরু কহিল, বিড়ি পিবেন মহারাজ!

চিতার আগুনের পানে চাহিয়া চাহিয়া চাটুজ্জে কহিল—দে।—ধুনির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া চাটুজ্জে চিতার পানেই চাহিয়া রহিল।

পৈরু কহিল—থোড়া বসবেন মহারাজ?

—তব, বসেন আপনি, হামি খাইয়ে লিই।

পৈরু একটা ঝাঁটা লইয়া ওই কুকুরের ঘরের মেঝেয় গিয়া ঢুকিল চারিটা পাশ ময়লায় ভর্তি। তারই একটা প্রান্ত ঝাঁটা বুলাইয়া জল ছিটাইয়া দিল। এবং ঐখানেই সে গামলা-ঢাকা খাবার লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে জ্বলন্ত চিতাটা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

চাটুজ্জে কহিল—চিতাটা যে নিবে এল পৈরু, আগুর ঝাড়তে হবে।

খাইতে খাইতে পৈরু কহিল—যাই হামি মহারাজ!

—খাবার দেরি কত তোর?

—দের থোড়া আছে। থাক, আমি যাই।

—থাক, তুই খা, আমিই দিচ্ছি ঝেড়ে।

চাটুজ্জে কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে চড়ায় নামিয়া পড়িল।

পৈরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল—না না দেওতা, বাড়ি যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে—।

অর্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল—তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ।

একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল—নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা—

—দূর বেটা! শিব নিজে একাজ করে জানিস? তোরা হচ্ছিস নন্দীর বাচ্চা।

পৈরু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। বাহিরের পথের উপর হইতে কে তাহাকে ডাকিল—পৈরু!

তাড়াতাড়ি পৈরু বাহির হইয়া আসিল এবং আহ্বানকারীকে দেখিয়া একান্ত অপরাধীর মতই কহিল—মাইজী!

রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কুসুম।

কুসুম কহিল—একবার ডেকে দাও পৈরু।

পৈরু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মহারাজ, মহারাজ, এ ঠাকুরজী!

মহারাজ তখন চিতাগ্নিটাকে প্রজ্বালিত করিতে করিতে বক্তৃতা শুরু করিয়া দিয়াছে—শৈব্যা, শৈব্যা।

জোর গলায় পৈরু আবার ডাকিল—ঠাকুর-জী!

চিতাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে চাটুজ্জে পৈরুকে ডাকিয়া কহিল—দেখে যা বেটা, দেখে যা, চিতা যার নাম, এ নইলে মানাবে কেন? জানিস পৈরু, এমনিধারা চিতা সারা দিনরাত যদি জ্বালিয়ে রাখতে পারিস—তবে ঠিক রাত্রে শ্মশান-কালীকে আসতে হবে। এ একটা যজ্ঞ রে!

পৈরু আবার ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম বাধা দিয়া কহিল—থাক

পৈরু, আমি খাবারটা দিয়ে যাই, তুমি খাইয়ো, বল না যেন আমি দিয়ে গেছি।

চালার একটা প্রান্ত কুসুম এক হাতে পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর অঞ্চলতলে ঢাকা খাবার, জলের ঘটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে পৈরু কহিল—সাথমে যাই হামি মাইজী।

কুসুম একটু হাসিল, কহিল—না বাবা, তুমি যাও, খাবারটা হয়ত কিছুতে খেয়ে দেবে। আমি একাই যেতে পারব।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কুসুম ডুবিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৈরু ফিরিল।

চিতাটা নাড়িতে নাড়িতে চাটুজ্জে কহিল—কি?

—হাতমুখ ধুয়ে আসেন। বেশ জ্বলেছে উ।

—তোর হল?

—হাঁ, আপনি শিগ্রি আসেন। ফেলেন, বাঁশ ফেলেন।

পৈরুর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ছিল, চাটুজ্জে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উঠিয়া আসিল।

অঙ্গুলিনির্দেশে খাবার দেখাইয়া দিয়া পৈরু কহিল—ভোজন করেন।—হামি আনাইলাম গো ওহি চাষাদের ছোকরাকে দিয়ে।

পৈরুর মুখপানে চাটুজ্জে তাকাইয়া কহিল—কুসুম দিয়ে গেল, নয় পৈরু?

—হাঁ, এতনা রাতমে মাইজী আসবে হিঁয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাটুজ্জে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে কহিল—সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়েছিল পৈরু, এই জন্যেই তোকে এত ভালোবাসি।

পৈরু উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল মাইজীর কথা। শ্মশানের চণ্ডাল সে, দুঃখের উচ্ছ্বাস সে অনেক দেখিয়াছে, বুক-ফাটা কান্না সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু দুঃখের এমন নীরব প্রকাশ সে আর দেখে নাই।

চাটুজ্জে আপন মনেই কহিতেছিল—আমাকে আর কেউ ভালোবাসে পৈরু, তুই ছাড়া?

পৈরুর মনে হইল, মাইজী যেদিন চিতায় চড়িবে সেদিন হয়ত বুকের জমা-করা কান্নায় চিতার আগুন জ্বলিবে না, নিবিয়া যাইবে। চাটুজ্জে আবার কহিল—কুসুমও আমায় ভালোবাসে পৈরু। কিন্তু—

কথাটা তাহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পৈরু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলেন মহারাজ-জী?

চাটুজ্জে উত্তর দিল না।

পৈরু ডাকিল—দেওতা!

চাটুজ্জে মুখ তুলিয়া চাহিল। চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করে ভাসে।

পৈরুর চোখ দিয়াও এবার জলধারা গড়াইয়া পড়িল:

চাটুজ্জে আবার কহিল কিন্তু জানিস পৈরু, খুকুমণির জন্যে ওর একটুও দুঃখ হয় নি; ও তার জন্যে কাঁদে না।

বাধা দিয়া পৈরু কহিল—মৎ বোল-না, ই বাত মৎ বোল-না, ঠাকুর-জী! মাইজীর আঁখের পানিতে দরিয়া বেড়ে গেল দেওতা। তুমহার আঁখ নেহি; তুমি দেখলে না।

সচকিত ভাবে চাটুজ্জে পৈরুর মুখপানে চাহিয়া কহিল—সত্যি পৈরু?

দৃঢ়কণ্ঠে পৈরু কহিল—সামনা মে গঙ্গাজী যেমন সাচ মহারাজ, ই বাত হামার তেমনি। ঝুট হোয় তো শিরমে হামার বাঁজ গিরবে দেওতা।

কতক্ষণ পর চাটুজ্জে ধীরে ধীরে কহিল—লোকে কত কি বলে ওই বুড়ো পালকে নিয়ে, কিন্তু সে মিথ্যে, আমি জানি। কিন্তু কুসুম কাঁদে খুকুমণির জন্যে? সারাদিনই যে মাতুর বোনে ও, দিনরাতই যে ওর পয়সা-পয়সা!

পৈরু এ কথার কোনো জবাব দিল না।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোল উঠিল—বল হরি হরি বো—ল। নূতন কে মহাপথ-যাত্রী আসিল।

সে রোলের প্রতিধ্বনি বনে বনে, গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ধ্বনিয়া দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। চকিত শৃগালের দল কলরব করিয়া উঠিল। গাছের মাথায় শকুনিরা পাখা ঝটপট করিয়া নড়িয়া বসিল।

টিনের চালায় মানুষ দুটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। হাতমুখ ধুইয়া চাটুজ্জে বিড়ি ধরায়, পৈরু শবের লকড়ি সংগ্রহ করিতে নিচে নামিয়া যায়।

নূতন কাঠ বহিয়া আনিয়া পৈরু আবার চিতা সাজাইল।

শববাহকের দল চিতায় শব তুলিয়া দিতে গেল।

পৈরু ডাকিল—ঠাকুর-জী!

কেহ উত্তর দিল না, চাটুজ্জে কখন চলিয়া গিয়াছে।

শবের কাপড় বিছানা ভাঁজ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া পৈরু শবের পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত বাঁশে ভর দিয়া পৈরু গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

—পৈরু!—চাটুজ্জে ফিরিয়া আসিল।

—মহারাজ!

—এ কেমন মড়া রে?

—ই যানেওলা হায় মহারাজ,—সাদা মাথা।

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিতেই পৈরু উপরে আসিয়া বসিল।

চাটুজ্জে চুপি চুপি কহিল—পৈরু!

—মহারাজ!

—কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।

চিতার আগুনে পৈরুর মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; সে মুখ তাহার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গঙ্গাজী সাচ হায় দেওতা; ঝুটা তো নেহি। ধুনির পাশে একখানা কম্বল বিছাইয়া চাটুজ্জে শুইয়া পড়িল; চিতাটার নির্বাণ অপেক্ষায় শ্মশানের বুকে চণ্ডাল জাগিয়া রহিল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান-ঘাটের রূপ একেবারে পাল্টাইয়া গেছে। ঘাটে বাজারে লোক আর ধরে না। স্তব-গানের রোলে পাখীর কলরবও ঢাকা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকে নৌকার মেলা; মহাজনী নৌকাগুলো উজানে গুনের টানে চলিয়াছে; জেলে-ডিঙিগুলা মোচার খোলার মত হেলিয়া দুলিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমা-রেখা পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ওপারের খেয়াঘাটে যাত্রীর দল, মাল-বোঝাই গাড়ির সারি, গরু-মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে। পথের পাশে কানা-খোঁড়ার সারি বসিয়া গিয়াছে।

—অন্ধজনে দয়া কর রানী-মা!

—খোঁড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান না।

একদল বাউল ছুটি ছেলেকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বাঁধা-ঘাটের পাশে পল্লীবাসিনীরা স্নান করিতেছে। কুসুমকেও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ও-পাড়ার বিশ্বাস-গিন্নি, কুসুমের সই-মা, কুসুমকে দেখিয়া কহিলেন —তাই তো মা কুসুম, কাল বাড়ি এসে সব শুনলাম; এখানে তো ছিলাম না। কি করবি বল মা—গাছের সব ফুল কটি কি থাকে? মনে কর ও তোর নয়।

কুসুমের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—ও কথা বল না সই-মা, সে আমার—সে আমার ছাড়া আর কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা, সেই সব।

—তাই হোক মা, তাই হোক, আশীর্বাদ করি তাই হোক। সে তোর খেলতে গিয়েছে, আবার ফিরে তোর কোলে আসুক।

স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল। গত বছরে ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে। কোনো একটা ফসলে ফুলও দেখা দিয়াছে।

চাটুজ্জে উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

দ্বিজদাসের দোকানে তখন অনেক ভিড়, সেখানে রাত্রের পাওনা-গণ্ডার হিসাব চলিয়াছে। মুদীর দোকানে কলাই না কিসের একটা ওজন হইতেছে —রামে-রাম—রামে রাম—রামে-দুই—দুই রাম।

পাল-কর্তার দোকানে রঙ-বেরঙের পুতুলের সারি।

চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। কিন্তু থমকিয়া সে দাঁড়াইল। দাওয়ার নিচে সন্ধ্যামণির একটা কচি-গাছ, সেটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কুসুম বোধ হয় দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিল, ঘর হইতে ডাকিল—এস।

চাটুজ্জে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

কুসুম আবার ডাকিল—এস।

সঙ্কোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান করে আসি রাত্রে শ্মশানে—।

হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক।

চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল।

দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা, পুতুল।

কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।